মূলপাতা

শুভঙ্করের ফাঁকি

Asif Adnan

2019-12-05 23:02:36 +0600 +0600

5 MIN READ

অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে ঘরে আটকে রেখে কীভাবে সামনে আগাবেন? মেয়েদের বস্তাবন্দী করে রেখে উন্নয়ন, প্রগতি আর পশ্চিমের সাথে পাল্লা দেয়ার স্বপ্ন দেখেন কীভাবে? অর্থনৈতিক উন্নতি ও প্রগতির স্বার্থে মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে অংশ নেয়া প্রয়োজন। জাতির অর্ধেকটা ঘরে বসিয়ে রাখার অর্থ হলো, তারা অর্থনীতিতে কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না। এটা একটা বিশাল লস। এভাবে কস্মিনকালেও আমাদের পূর্ণ অর্থনৈতিক সম্ভাবনা আমরা অর্জন করতে পারব না।

শুনতে বেশ যৌক্তিক মনে হয়, স্বীকার করতেই হবে। ফেমিনিস্টদের জনপ্রিয় করা এ যুক্তির এতবার, এত বিভিন্নভাবে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে যে, ঘোরতর ধার্মিক বলে পরিচিত অনেক মানুষও এখন একে সত্য বলে মেনে নেন। তবে সহজ এবং আপাতদৃষ্টিতে শক্ত এ যুক্তির মাঝে ফাঁকি আছে। নারীকে ঘর থেকে বের করে এনে কাজে ঢুকিয়ে দেয়ার সময় শুধু মাথাপিছু উপার্জন বাড়ার ব্যাপারটা এখানে তুলে ধরা হয়, কিন্তু এর যে অন্য প্রভাব আছে, অপরচুনিটি কস্ট আছে সেটা আমরা দেখি না। দেখি না কারণ নারীর ঘরের কাজগুলোকে আমরা আগেই মূল্যহীন ধরে নিয়েছি।

অনস্বীকার্য সত্য হলো একজন নারী ঘরের ভেতরে যে ভূমিকা পালন করেন তার বাজারমূল্য নির্ধারণ এবং টাকা দিয়ে বিকল্প কেনা সম্ভব না। হ্যাঁ, রান্নাবান্নাসহ ঘরের অন্যান্য কাজের জন্য বিকল্প হয়তো টাকা খরচ করে পাওয়া যাবে, কিন্তু সন্তানকে সময় দেয়া? গড়ে তোলা? মায়ের ভালোবাসা? এগুলোর বিকল্প কী? আর সেটার দামই বা কেমন? মজবুত পরিবার, সামাজিক সংহতি এবং শিশুর সুস্থ ও পূর্ণাঙ্গ মানসিক বিকাশের পেছনে এর গুরুত্ব জিডিপি-জিএনপির মতো পরিসংখ্যানের ছকে মাপা সম্ভব না।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সমাজ ও পরিবারে নারী ও পুরুষের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন সহজাত ভূমিকা। পুরুষের কাজ হলো পরিবারের জন্য উপার্জন করা, পরিবারকে নিরাপত্তা দেয়া। নারীর কাজ হলো মায়ের ভূমিকা পালন করা, একটা ইট-কাঠের কাঠামোকে ঘরে রূপান্তর করা। পারিবারিক বিষয়গুলোতে নারী এবং পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব, টেম্পারমেন্ট এক রকম হয় না। স্থান-কাল-পাত্রভেদে এগুলো ধ্রুব সত্য। এটাই নারীর জন্য নির্ধারিত ভূমিকা। এগুলো সমাজ কিংবা 'পুরুষতন্ত্র' ঠিক করে দেয় না; আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বেঁধে দেয়া অমোঘ নিয়ম অনুযায়ী ঘটে। এ কারণেই নারীত্বের পূর্ণতা মাতৃত্বের সাথে সম্পর্কিত। ক্যারিয়ার কিংবা মাথাপিছু আয় বাড়ানোর সাথে না।

আমরা বাংলায় বলে থাকি পুরুষরা পরিবারের হাল ধরেন, কিন্তু আমার মতে শাব্দিকভাবে হাল ধরার অর্থটা পরিবারে নারীদের ভূমিকার সাথেই বেশি যায়। হালের কাজ হলো নৌকা বা জাহাজ কোন দিকে যাবে তা ঠিক করা। ইঞ্জিন কিংবা দাঁড়টানা মাঝির কাজ হলো নৌকাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এ কাজটা করেন বাবা। পরিবারের শিশুদের বিকাশের গতিপথ প্রাথমিকভাবে মায়ের ওপরই নির্ভর করে। যদি হাল বিগড়ে যায় কিংবা না থাকে তবে নৌকা এগোবে তো বটে, কিন্তু গন্তব্য পৌঁছানো খুব কঠিন হয়ে যাবে। বিশেষ করে আজকের নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি, আকাশসভ্যতা, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, আপেক্ষিক নৈতিকতা, মাদকাসক্তি আর পুঁজিবাদী যৌনায়নের যুগে।

কিন্তু নারীমুক্তি আর নারীবাদের নামে নারীকে (এবং পুরুষকেও) বোঝানো হয়েছে পুরুষের অনুকরণ, পুরুষ যা করতে পারে তা করতে পারার মাঝেই নারীজন্মের সার্থকতা নিহিত। আমাদের বোঝানো হয়েছে ঘরের ভেতরে নারী যে ভূমিকা পালন করে তা আসলে তুচ্ছ। এক ধরনের বন্দিত্ব। আর তাই ঘরের বাইরে নারীকে নিয়ে আসা এবং ঘরের বাইরে রাখার মাঝেই প্রগতি, উন্নয়ন আর সার্থকতা। সেই সাথে নারীর জন্য বেঁধে দেয়া হয়েছে কাজ আর পরিবার ব্যালেন্স করার অসম্ভব এক স্ট্যান্ডার্ড।

ঘরের বাইরে থাকা, পুরুষের সাথে পাল্লা দেয়া, শরীর প্রদর্শন আর যথেচ্ছ যৌনতার মতো বিষয়গুলো কোনো একভাবে চিন্তার

জগতে চালু হয়ে গেছে স্বাধীনতা ও অধিকারের সমার্থক শব্দ হিসেবে। নারীবাদ, নারী-স্বাধীনতা ও নারী অধিকারের এই যুগে নারীদেহ পরিণত হয়েছে সর্বাধিক ব্যবহৃত, সস্তা ও সহজলভ্য পণ্যে। আধুনিক বিজ্ঞাপনে নারীদেহ লবণের মতো। সব কিছুতেই একটু না একটু দিতে হয়।

পশ্চিমা লিবারেল আইডিওলজি এবং মিডিয়া 'ঘর নামের জেলখানার দরজা ভাঙার' মন্ত্র শুনিয়ে নারীর শরীরকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে সর্বসাধারণের জন্য। ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা বলে নারীকে স্বাধীনতা দিয়েছে তার শরীরকে নিলামে তোলার। আস্তে আস্তে গুরুত্ব হারিয়েছে নারীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সামাজিক ইউনিট হিসেবে দুর্বল হয়েছে পরিবার। পরিবার যত দুর্বল হয়েছে, ততই দুর্বল হয়েছে পারিবারিক শিক্ষা, ততই দুর্বল হয়েছে নৈতিকতার কাঠামো। বেড়েছে পরিবারের ভাঙন, ব্যভিচার, গর্ভপাত, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অবিশ্বাস, সম্পর্কের টানাপোড়েন, শিশু-কিশোরদের মধ্যে অপরাধ, মাদকাসক্তি এবং বিষণ্নতার হার। পশ্চিমা এ হাওয়া আমাদের শরীরেও লেগেছে, উপনিবেশে এখন পুনরাবৃত্তি হচ্ছে কেন্দ্রের মতো সেই একই প্যাটার্নের।

খুব বেশি না, আজ থেকে দুই শ বছর আগে ইউরোপজুড়ে শিশুশ্রম বৈধ ছিল। ৭-৮ বছর বয়স হবার পর শিশুরা কাজ শুরু করবে, কামাই করবে, এটা ছিল সমাজের রীতি। গড়ে দৈনিক ১০-১৬ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করত ইউরোপ-অ্যামেরিকার শিশুরা। ১৮২১ এর দিকে ব্রিটেনের মোট শ্রমশক্তির ৪৯% ছিল শিশু। অবধারিতভাবেই শিশুদের উপার্জন গুরুত্বপূর্ণ ছিল অর্থনীতি এবং প্রবৃদ্ধির জন্য। এক শ বছর আগেও অ্যামেরিকার ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছিল প্রায় ২০ লক্ষ শিশুশ্রমিক। শুধু মাথাপিছু আয়ের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে শিশুশ্রমের ব্যাপারটা লাভজনক। একসাথে অর্থনীতিতে অনেক সস্তা শ্রম পাওয়া যায়, লোকবল বাড়ে, কমে উৎপাদনের খরচ। প্রফিটেবল।

কিন্তু তবুও একসময় ইউরোপ ও অ্যামেরিকাকে এ অবস্থান সরে আসতে হয়েছে। কারণ, আপাতদৃষ্টিতে দেখা, জিডিপি-জিএনপির পাল্লায় মাপা শিশুশ্রমের এ লাভের আড়ালে লুকিয়ে আছে অনেক চড়া দাম। যার অল্প কিছু ছবি চার্লস ডিকেন্স তুলে এনেছিলেন তার বিখ্যাত 'অলিভার টুইস্ট' বইটিতে। তাই পশ্চিমকে একসময় বাধ্য হতে হয়েছে 'লাভ' এর হিসেব বাদ দিয়ে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে।

একই কথা নারীর ক্ষেত্রেও সত্য। উন্নতি আর সম্পদের সংকীর্ণ সংজ্ঞার জায়গা থেকে দেখলে যেটাকে লাভ মনে হচ্ছে, একটু পিছিয়ে এসে পুরো ছবিটার দিকে তাকালে সেই উপসংহার বদলে যাবে। প্রশ্ন হলো, স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে সেই বদলে যাওয়া উপসংহার মেনে নেয়ার সৎসাহসটুকুআমাদের আছে কি না।